ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১৯৯-২১৮
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4311

তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মাহমুদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Turkey's military has historically enjoyed a guardianship role in the country; however, CMR (Civil–military relations) have evolved over time due to changes in agency and political circumstances.Turkish civil–military relations have historically been shaped by the military's role as both a protector of the state and a guardian of Kemalist principles and secular constitution. Since the founding of the Republic in 1923, the Turkish Armed Forces (TAF) positioned itself as a main political actor, staging several coups (1960, 1971, 1980, 1997and 2016) to preserve secularism and national unity. However, with democratic consolidation, EU accession reforms in the early 2000s, and the rise of the Justice and Development Party (AKP), civilian supremacy gradually increased. The failed coup attempt of July 2016 further redefined this balance, leading to significant restructuring of the military under tighter government control. Today, while the TAF remains an influential institution, civilian authority under the presidency exercises stronger oversight, marking a transition from military guardianship toward civilian control, though tensions over autonomy and political influence still persist.

Keywords: Coup, Civil-Mimitary relations, Politics, Military intervention, RPP, AKP.

১. ভূমিকা

বিশ্বের যে-কোনো দেশের রাজনীতিতে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সমরবিশারদগণ রাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক নিয়ে প্রচুর গবেষেণা করেছেন এবং তারা এ বিষয়ে নানা তত্ত্ব ও মডেল উপস্থাপন করেছেন। এই তত্ত্ব ও মডেল বিশ্লেষণ করে সেই আলোকে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর প্রভাব এবং সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হবে বর্তমান প্রবন্ধে। তুরস্কের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং হাল আমলেও রয়েছে, তবে পূর্বের মতো নয়। কেবল প্রজাতান্ত্রিক শাসনামলে নয়, অটোমান শাসনামলেও তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা যেমন ছিল, প্রভাবও কোনো অংশে কম ছিল না। তাই অটোমান আমলে সামরিকবাহিনী ছাড়া বেসামরিক সরকার কল্পনাই করা যেতো না। যুদ্ধ কিংবা সামরিক অভিযান ছাড়া বাকি সময়ে প্রভাবশালী পাশারা[১] অটোমান সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। অটোমান শাসকরা মনে করতেন শান্তিকালীন সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক যুদ্ধ কিংবা সামরিক অভিযানে সফলতার পূর্ব শর্ত। ত্রয়োদশ শতকে অটোমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তুর্কিদের সামরিক প্রতিভার ফল হিসেবে।[২] একইভাবে ১৯২৩ সালে অটোমান রাজবংশের ধ্বংসস্তূপের ওপর তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তুর্কি সেনাকর্মকর্তাদের আন্দোলন, সংগ্রাম ও সশস্ত্র পদক্ষেপের ফল হিসেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্র হিসেবে অটোমান তুরস্ক পরাজিত হলে তুরস্ক মিত্রশক্তির 'গনিমতের মাল' হিসেবে পরিগণিত হয় এবং মিত্রশক্তি বিভিন্ন চুক্তির[৩] মাধ্যমে অটোমান সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে বণ্টনের নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে অটোমান সেনাবাহিনীর 'তৃতীয় বাহিনীর' প্রধান সেনাপতি মোস্তফা কামাল পাশা অটোমান খলিফার অধীনতা অস্বীকার করে মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে ১৯১৯ সালে ১৯ মে আনাতোলিয়ার সামসুনে অবতরণ করে স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাক দেন। কামাল পাশার আহ্বানে সামরিক-বেসামরিক সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর তুরস্ক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে তুরস্কের জাতীয় রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর একচেটিয়া প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তুরস্কের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তুরস্কের রাজনীতিতে কামালপন্থিরা পরাজিত হলে সামরিকবাহিনী সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। তুরস্কের সামরিকবাহিনী ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮০ ও ১৯৯৭ সালে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল।[৪] ২০০২ সালে তুরস্কের রাজনীতিতে ইসলামপন্থি রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' ক্ষমতাসীন হলে সামরিকবাহিনী যেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে একইভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারও সামরিকবাহিনীকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ফলে শুরু হয় সামরিক-বেসামরিক দ্বন্দ্ব। ফলে ২০১৬ সালে তুরস্কের রাজনীতিতে আবারও দেখা দেয় সামরিক অভ্যুত্থান, যদিও এই অভ্যুত্থান সফল হয়নি। তাই তুরস্কের জাতীয় রাজনীতিতে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কেন তুরস্কের রাজনীতিতে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে? চলমান গবেষণায় এটিই আমাদের মৌলিক গবেষণা প্রশ্ন। তাছাড়া সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য কতটা ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করা চলমান গবেষণার অন্যতম একটি লক্ষ্য। সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কে ওপর একাধিক তাত্ত্বিক তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেছেন। যাঁরা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্যামুয়েল পি হান্টিংটন ও মরিস জানোউইজ। আলোচ্য প্রবন্ধে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনার প্রয়াস রয়েছে এবং এই আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তুরস্কের রাজনীতিতে বারবার সেনা অভ্যুত্থানের

রহস্য যেমন উন্মোচিত হবে, তেমনি তুরস্কের স্থিতিশীল রাজনীতির জন্য সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ভূমিকা সম্পর্কেও জানা যাবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

'সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক পর্যালোচনা : প্রসঙ্গ তুরস্ক' শীর্ষক গবেষণাটিতে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত 'গুণগত গবেষণা পদ্ধতি' বা Qualititive Method অনুসরণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা, সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত ফিচার থেকে যাচাই বাছাই করে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তুর্কি সামরিকবাহিনীর ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্য চিত্র গবেষণায় তথ্যের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উল্লেখিত দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে গৃহীত তথ্য-উপাত্ত নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩. সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ধারণা

ইংরেজিতে Civil-Military Relations বিশ্বব্যাপী একটি অতি পরিচিত ও আলোচিত বিষয়। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক। এখানে সামরিক বলতে একটি রাষ্ট্রের সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর সম্মিলিত রূপকে বোঝায়। তবে তুরস্কের জান্দারমা নামক বিশেষ বাহিনী যুদ্ধের সময় সশস্ত্র বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আর সিভিল বা বেসামরিক বলতে সাধারণত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে বোঝালেও এখানে রাষ্ট্রের বেসামরিক সরকারকে বোঝানো হয়েছে, হোক সেটা নির্বাচিত বা অনির্বাচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণধর্মী তত্ত্ব প্রণয়ন করেছেন। সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের মৌলিক ধারণার মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত চীনা সমরবিশারদ সান জু-এর বিশ্লেষণে । তিনি বলেন যে, সামরিকবাহিনী গঠনগতভাবে রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ।[৫] অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মান সমর বিশ্লেষক ক্লজইউজও সামরিকবাহিনীকে রাষ্ট্রের অধীন একটি শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামরিকবাহিনী সম্পর্কে এই চলমান ধারণার ভিত নড়ে ওঠে। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৮-১৯৪২) কারণে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো স্ব স্ব সামরিকবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করে তোলে। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর প্রভাব বেড়ে যায়। তাছাড়া এ সময়ে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে পেছনে ফেলে সামরিকবাহিনী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে । এ সম্পর্কে K Charles H. Kennedy and David J. Louscher বলেন,

> Over three-fourth of the new states that have emerged since 1945 have undergone, at one time or another, direct military rule. In most of the remainder the role of military in politics, although not as praetorian rulers, has been significant.Indeed, the military as an institution is clearly one of the most impotant political actors in the

policy environment facing virtually all new states, vying in importance with other state institutions such as civil bureaucracies, legislatures, political parties and the court.[৬]

একটি পরিবার যেমন সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তেমনি একটি রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। যে-কোন রাষ্ট্রের বেসামরিক ও সামরিক পরিমণ্ডলের গঠনগত মৌলিক পার্থক্য থাকে। সামরিক শক্তিকে যদি রক্ষণশীল বলা হয়, তাহলে বেসামরিক শক্তিকে কিছুটা সংবেদনশীল ও পরিবর্তনশীল বলা যায়। একটি রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রগতির জন্য এই রক্ষণশীল ও সংবেদনশীল ধারা দুটির সহপ্রবাহ গুরুত্বপূর্ণ। আর রাষ্ট্রে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার জন্য সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত হওয়া অতীব জরুরি। রাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ভালো হলে, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে যা একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। আর সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক যদি খারাপ হয় তাহলে রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সামরিকবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেসামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আবার বেসামরিক শক্তি ক্ষমতাসীন হলে সামরিক শক্তিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় যে, ভবিষ্যতে সামরিকবাহিনী আর যাতে বেসামকি শক্তির ওপর মাথাচাড়া দিতে না পারে। উদাহরণ হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। যাহোক, সামরিক-বেসামরিক শীতল সম্পর্কে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ এমনভাবে দুর্বল হয়ে যায় যে, সেটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের ফলে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়ে যেতে পারে।

৪. সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য

সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের উদ্দেশ্য মহৎ ও সুদূরপ্রসারী। যে-কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ওপর। রাষ্ট্রপরিচালনায় সুদৃঢ় সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক নিম্নলিখিতভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

ক. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকারের পাশাপাশি সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের পরিধি নিশ্চিতকরণ।

খ. জাতীয় প্রতিরক্ষায় সামরিকবাহিনীকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে নিয়োগ।

গ. বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও স্বচ্ছতাভিত্তিক সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

ঘ. দেশের যে-কোন ধরনের জাতীয় সংকটে বা দুর্যোগে বেসামরিক সরকারের পাশাপাশি সামরিক কর্তৃপক্ষকে জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় এগিয়ে আসা।

ঙ. জাতীয় রাজনীতি গভীর সংকটে নিপতিত হলে বা রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হলে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সামরিকবাহিনী রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করতে বেসামরিক সরকারের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা।

৫. সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক কাঠামো

তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হলে বিশ্বের প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ওপর যেসব তত্ত্ব ও মডেল প্রদান করেছেন তার আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সেটাই হবে চলমান গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বা থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ওপর বিস্তারিত গবেষণা করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন (Samuel P.Huntington) ও মরিস জানোউইজ (Morris Janowitz) । সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ওপর হান্টিংটনের বিখ্যাত গ্রন্থ *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relations* (১৯৫৭) এবং মারিস জানোউইজ এর '*The Professional Solder* (১৯৬০)। এই উভয় গ্রন্থে বেসামরিক-সামরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে সামরিক দক্ষতা (Military Effectiveness) এবং বেসামরিক নিয়ন্ত্রণের (Civilian Control) এর ওপরে উভয়ে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন।[৭] নিম্নে বেসামরিক ও সামরিক সম্পর্কের উল্লিখিত তত্ত্ব ও মডেলের ওপর আলোকপাত করা হলো-

ক. ইনস্টিটিউশনাল থিওরি বা প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্ব

মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন সামরিক ও বেসামরিক বলতে দুটি পৃথক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছেন। আর এ প্রতিষ্ঠান দুটি স্বতন্ত্র নীতিমালা ও শিষ্টাচার অনুসরণ করে। তিনি সামরিক চিন্তা চেতনাকে রক্ষণশীল এবং বেসামরিক কার্য প্রণালিকে সংবেদনশীল ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হান্টিংটন রাষ্ট্রের স্বার্থে বেসামরিক রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ বা বেসামরিক সরকারের নেতৃত্বে সামরিকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের জন্য বেসামরিক সরকার কর্তৃক সামরিক শক্তির ওপর Subjective Control এর পরিবর্তে Objective Control প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছেন। Objective Civilian Control এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিকবাহিনীর লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেবে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে সে লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মোটকথা বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকবে যা নিশ্চিত করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ বা বেসামরিক সরকার। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। হান্টিংটন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, 'রাষ্ট্রের জন্য পেশাদার সামরিকবাহিনী তৈরি করতে হবে এবং তারা রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে।' তুরস্কের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই তত্ত্বটা তুরস্কে খুব একটা কার্যকর ছিল না। এখানকার সামরিকবাহিনী দক্ষতা ও যোগ্যতায় আন্তর্জাতিকমানের হলেও তারা একাধিকবার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে (যেমন ১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮০, ১৯৯৭)। এক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর ধর্মনিরপেক্ষতায় রক্ষায় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ হান্টিংটনের এই মডেলকে আংশিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। Samuel P Huntington বলেন, "It is Possible to define a equilibrium called 'Objective Civilian Control' that ensures civilian

control and maximizes security at the same time"[৮]. তিনি সামরিকবাহিনীর পেশাদারিত্ব সম্পর্কে বলেন- "In practice, Officership is strongest and most effective when it most closely approches the professional ideal; it is weakest and most defective it falls short of that ideal" [৯] তবে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এক বক্তৃতায় সামরিকবাহিনীকে উর্দি পরিহার করে রাজনীতিতে আসার কথা বলে একদিকে যেমন সামরিকবাহিনীর পেশাদারিত্বের কথা স্মরণ অন্যদিকে ইতিবাচক সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। পরবর্তীতে হান্টিংটন ১৯৫৭ সালে তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের বক্তব্যকেই উপস্থাপন করেছেন।

খ. কনভারজেন্স থিওরি বা সমধর্মী তত্ত্ব

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরিস জানোউইজ এই তত্ত্বটি প্রদান করেছেন। তিনি এই তত্ত্বের আলোকে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, বেসামরিক ও সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার হওয়া সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এই দুই শক্তিকে একটি বিন্দুতে সম্মিলিত হতে হবে। তিনি এই ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরিতে বিভিন্ন যৌথ প্রশিক্ষণ ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বেসামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যৌথকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন। এই তত্ত্বটি সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেক সময় সম্পর্কোন্নয়নের জন্য বেসামরিক সরকারের প্রধান সামরিকবাহিনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামরিক পোশাক পরে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া সামরিকবাহিনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেসামরিক সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সশস্ত্র সালাম গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রাচার অনুযায়ী সরকার প্রধান ও রাষ্ট্র প্রধানকে বিমান বন্দরে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তিন বাহিনীর প্রধান অন্যান্য বেসামরিক আমলা ও নেতৃবৃন্দের সাথে উপস্থিত থাকেন। সাংবিধানিকভাবে অনেক দেশেই রাষ্ট্রপ্রধান সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যা সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০০ সালের পর থেকে তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের ভূমিকা রয়েছে।

গ. এজেন্সি থিওরি বা প্রতিনিধিত্বমূলক তত্ত্ব

এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, সামরিকবাহিনী বেসামরিক সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পিটার ডি ফিবার মাইক্রো ইকোনমিকসের গঠনের আদলে বেসামরিক নেতৃত্বকে নীতিমালা নির্ধারণের দায়িত্ব এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে প্রণীত নীতিমালার আলোকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের কথা বলেছেন। যেসকল রাষ্ট্রে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ সেখানে এই তত্ত্ব অধিক কার্যকর। এটা অনেকটা স্যামুয়েল পি হান্টিংটনের Objective Civilian Control তত্ত্বের প্রতিধ্বনি। তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নব গঠিত রাষ্ট্রের সামরিকবাহিনী পরিচালিত হয়েছে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের একক নির্দেশে। কখনো কখনো সামরিকবাহিনী রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠলে আতাতুর্ক কঠোর ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

উচ্চারণ করে বলেছেন যে, রাজনীতিতে আগ্রহী হলে উর্দি খুলে আসতে হবে। এভাবে তিনি সামরিকবাহিনীর ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঘ. গার্ডিয়ানশিপ মডেল

গার্ডিয়ানশীপ মডেল তুরস্কের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত একটি মডেল, এটাকে অনেকে আতাতুর্ক মডেলও বলে থাকেন। এই মডেলে সামরিকবাহিনী হলো রাষ্ট্রের অভিভাবক। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধান রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব সামরিকবাহিনীর। সামরিকবাহিনী বিশ্বাস করে রাষ্ট্রের সংকটকালে তারাই শেষ সিদ্ধান্ত নেবে অন্য কেউ নয়। তুরস্কের সামরিকবাহিনীও এর ব্যতিক্রম নয়। তুরস্কের সামরিকবাহিনী নিজেদের আতাতুর্কের অনুসারী এবং কামালবাদের রক্ষক বলে মনে করে। সেকারণে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীই হচ্ছে প্রধান রক্ষা কবজ। তুরস্কের সামরিকবাহিনী কেবলই নিজেদের একটি তথাকথিত প্রতিরক্ষা বাহিনী বলে মনে করে না, তারা নিজেদেরকে তুর্কি জাতি ও মাতৃভূমির প্রধান ত্রাণকর্তা বলে মনে করে।

৬. যুদ্ধ ও শান্তিকালীন সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক জাতীয় নিরাপত্তা নীতিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যুদ্ধ কিংবা শান্তি যে-কোনো পরিস্থিতিতেই এই সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। সাধারণত যুদ্ধকালীন বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ অন্তরঙ্গভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু শান্তিকালীন এই সম্পর্কের রূপরেখা কী হওয়া উচিত– তা নিয়ে বিস্তর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শান্তিকালীন সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের মৌলিক ভিন্নতা। যে-কোন রাষ্ট্রের প্রগতির জন্য রক্ষণশীল সামরিক শক্তি ও সংবেদনশীল বেসামরিক শক্তির মধ্যকার সুসম্পর্ক অতীব জরুরি। শান্তিকালীন রাষ্ট্রের গতিশীলতার জন্য এ দুটি ধারার দ্বন্দ্বহীন সম্পর্ক প্রয়োজন। গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে শান্তিকালীন এই প্রবাহ বহমান রাখার জন্য দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ–

১. বেসামরিক শক্তি কীভাবে সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ এই নিয়ন্ত্রণের ওপরই নির্ভর করবে একটি রাষ্ট্রের স্বাভাবিকতা। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের তত্ত্ব অনুসারে Objective Civilian Control মাধ্যমে বেসামরিক সরকার যদি সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে তা রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। আর বেসামরিক কর্তৃপক্ষ যদি Subjective Control এর মাধ্যমে সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে তা রাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক কোন ফল বয়ে আনবে না বরং সামরিক শক্তির স্বকীয়তা নষ্ট করবে। অন্যদিকে Objective Control সামরিক শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকারিতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তুরস্কের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শান্তিকালীন তুরস্কে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক কিছুটা দ্বান্দ্বিক হলেও যুদ্ধকালীন এ সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ১৯৭৪ সালে সাইপ্রাস ইস্যুকে কেন্দ্র করে তুরস্ক ও গ্রিস যুদ্ধ হলে

তুরস্ক সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করে।[১০] এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও তুরস্ককে প্রতিহত করা যায়নি।

২. আদর্শ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ নীতিমালা বা কার্যপ্রণালি প্রণয়ন করবে এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে তিনটি ধাপ অনুসরণ করা প্রয়োজন।

ক. জাতীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা থাকতে হবে–যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রণকৌশল নির্ধারণ করা হবে।

খ. রাষ্ট্রীয় রণকৌশল বাস্তবায়নের জন্য শক্তিশালী সামরিক কাঠামো থাকতে হবে।

গ. রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বা বেসামরিক সরকারকে প্রয়োজনীয় সামরিক সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুযোগ সৃষ্টির ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেবল তুরস্ক নয় তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রই সামরিকবাহিনীর পেশাগত সুযোগ-সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। সরকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেসামরিক প্রতিষ্ঠান থেকে সামরিক প্রতিষ্ঠান বা সামরিকবাহিনীর বিশেষ কোরকে দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। তুরস্কে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের বেসামরিক সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রদান করে থাকে। বর্তমান তুরস্কে সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্ক ইতিবাচকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে– তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদেয়ান সদ্য সাবেক সেনাপ্রধান ও চীফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল ইয়াসের গুলারকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করছেন এবং সাবেক জাতীয় গোয়েন্দা (মিট) প্রধান হাসান ফিদানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন যা পূর্বে কল্পনাও করা যায়নি।[১১]

৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ব ইতিহাসে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাফল্যের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের আদর্শ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয়। একইভাবে ভারতে স্বচ্ছ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ভারতীয় গণতন্ত্রকে বেগবান রেখেছে। বিপরীত ক্রমে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক পাকিস্তানের রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছে। একইভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-পরবর্তী সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক বাংলাদেশের রাজনীতিকেও অস্থিতিশীল করে তুলেছে ফলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের সামরিক শক্তির ওপর সঠিক নিয়ন্ত্রণ কতটা জরুরি, তার প্রমাণ মেলে দক্ষিণ আমেরিকার গুয়েতেমালার গত দশকে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। ২০০৪ সালে গুয়েতেমালার প্রেসিডেন্ট বার্জার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সামরিক শক্তির সাথে কোনো আলোচনা না করেই ৫০ শতাংশ সামরিক শক্তিকে কমিয়ে আনেন। এতে পুরো দেশটির নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। ২০০৮ সালে প্রেসিডেন্ট

আলতারো কোলোব সামরিকবাহিনীকে সংখ্যায় দ্বিগুণ করেন এবং এর গুণগত মানবৃদ্ধি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের (১৯৫৪-৭৫) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মার্কিন সাফল্য অর্জিত না হওয়ার পেছনে যে কারণগুলোকে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে অন্যতম– তৎকালীন মার্কিন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সামরিকবাহিনীর ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ। ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপের সামরিকবাহিনী গতানুগতিক প্রথাগত সামরিক কৌশল ব্যবহার করেনি। তাই যুদ্ধে মার্কিন সামরিক জেনারেলরা পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুদ্ধনীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু বেসামরিক মার্কিন নেতৃত্ব যুদ্ধনীতির বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়াতে সামরিকবাহিনীকে তা অনুসরণ করতে হয়। ফলে এই যুদ্ধের ফলাফল মার্কিনীদের পক্ষে যায়নি তা আজ সর্বজনবিদিত। মার্কিনীরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে উপসাগরীয় যুদ্ধে মার্কিন সামরিকবাহিনীর ওপর Objective Control বা লক্ষ্য নির্ধারণমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে যা মার্কিন সামরিকবাহিনীকে স্বকীয়ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে সামরিক অপারেশন পরিচালনার সুযোগ দেয়। স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের যে উপদেশ দিয়েছেন তা যুদ্ধ কিংবা শান্তি উভয় সময়ে বরাবর সফল হয়েছে।

জাতীয় রাজনীতিতে সামরিকবাহিনী সম্মানজনক অবস্থানে থাকলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অবশ্যই এর প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক সামরিক জোট ন্যাটোতে তুরস্কের সদস্য পদ লাভ সামরিক-বেসামরিক সুসম্পর্ক তথা তুর্কি সামরিকবাহিনীর পেশাগত দক্ষতার প্রমাণ।

৮. তুরস্কে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে জটিল। তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ইতিহাস যেমন পুরোনো গতিপ্রকৃতিও তেমনি বৈচিত্র্যময়। অটোমান শাসনামলের স্বর্ণযুগ পর্যন্ত সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকে অটোমান সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সামরিকবাহিনী আতাতুর্ক সরকারের আজ্ঞাবহ হলেও অচিরেই সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের এই ধারা পরিবর্তিত হয়। ১৯৬০ সালে তুর্কি সামরিকবাহিনী সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। একইভাবে ১৯৭১, ১৯৮০ ও ১৯৯৭ সালে সামরিকবাহিনী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ২০১৬ সালেও ইসলামপন্থি এরদোয়ান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হলেও তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তুরস্কের রাজনীতিতে এ সকল অভ্যুত্থান বা সেনা হস্তক্ষেপ ছিল সামরিক-বেসামরিক তিক্ত সম্পর্কের ফল। নিম্নে তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা হলো–

ক. অটোমান আমলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়কালকে বলা হয় অটোমান স্বর্ণযুগ। অটোমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে তিন মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির মূলে

প্রধান ভূমিকা ছিল অটোমান সামরিকবাহিনীর। অটোমান সুলতান তাঁর সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে নিয়মিত সেনা ও নৌ বাহিনীর পাশাপাশি অধিকতর শক্তিশালী একটি বাহিনী হিসেবে ১৩৮৩ সালে জ্যানিসারি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে এই বাহিনী নিয়ম শৃঙ্খলা ও সুলতানের প্রতি আনুগত্য ভুলে গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সুবিধা আদাই করার জন্য নানা ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সুলতান-খলিফাদের নিয়ন্ত্রণসহ তাদের পরিবর্তনের জন্য প্যালেস ক্যু বা প্রাসাদ অভ্যুত্থান সংঘটিত হতো। সুলতান তৃতীয় সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭) জ্যানিসারি বাহিনীর অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। জ্যানিসারি বাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে ১৮২৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এই বাহিনীকে বিলুপ্ত করেন।[১২] রাজনীতিতে জ্যানিসারি বাহিনীর হস্তক্ষেপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Bernard Lewis বলেন, "Due time however, and with the appearance of weak sultans, the Janissaries started to realise their corporate strength and begin to play a more direct role in the political affairs of the Empire[১৩]"

একদিকে জ্যানিসারি বাহিনী বিলুপ্ত অন্যদিকে 'নিজামই-জাদিদ' নামে নতুন বাহিনীর আত্মপ্রকাশ অটোমান সামরিকবাহিনীকে শঙ্কিত করে তুলেছিল। সামরিকবাহিনীর কর্পোরেট ইন্টারেস্ট বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ায় সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে সাধারণ জনগণের অধিকার প্রশ্নে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হলে সামরিকবাহিনীর প্রভাবশালী একটি অংশ প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে আন্দোলকারীদের সমর্থন প্রদান করে। সামরিকবাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক নেতৃবৃন্দের সাথে একত্রিত হয়ে সিউপি নামে একটি গোপন রাজনৈতিক দল গড়ে তোলে। অনেক ঐতিহাসিকই অটোমান সরকার ও সেনাবাহিনীকে একটি দেহে দুটি প্রাণ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, সেনাবাহিনীর অবস্থান, মর্যাদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পদাধিকারবলে প্রধান সেনাপতিকে সুলতান ক্যাবিনেটের সদস্য করতেন। সেনাবাহিনীর এ ধরনের অবস্থান থাকার ফলে রাজনৈতিক নানা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সম্পৃক্ততার বিষয়টি সুলতান-খলিফারা কখনো ইতিবাচকভাবে আবার কখনো নেতিবাচকভাবে দেখেছেন। সেনাবাহিনী যেহেতু সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, তাই তাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সবসময় নেতিবাচকভাবে দেখা হয়নি। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বিশ্বাসী ওসমানীয় সেনাবাহিনীর একদল অফিসারের সাথে ওসমানীয় সুলতান আব্দুল হামিদের নানা বিষয়ে মতবিরোধ তৈরি হয় তা তাদেরকে ওসমানীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করে। এ সম্পর্কে Dr. Gerassimos karabelias বলেন " In the begining, the western oriented officers succeeded in limiting the absolute political power of the sultan by forcing him to introduce, in 1876, the first constitution and establish the first parliament in the country's political life.[১৪]"

গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের তিক্ততার ফল হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিপ্লবী সেনাকর্মকর্তাদের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং বেসামরিক সরকারের পতন ঘটে। ১৯০৮ সালে যুবতুর্কিরা ক্ষমতসীন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ফলে জাতীয় রাজনীতির সকল হিসাব-নিকাশ পালটে যায়, শুরু হয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থে একটি ইতিবাচক অবস্থানে উন্নীত হয়। অর্থাৎ সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সামরিক সমর্থনপুষ্ট যুবতুর্কি সরকারের একগুঁয়ে সিদ্ধান্তের কারণে তুরস্ককে জার্মানির নেতৃত্বাধীন অক্ষশক্তির পক্ষে অংশ নিতে হয়। এই যুদ্ধে জার্মানি হেরে যাওয়ায় তুরস্ককেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। ফলে মিত্রশক্তি ইস্তাম্বুলসহ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়। শুরু হয় মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। মোস্তফা কামাল ও তাঁর সমর্থনপুষ্ট সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে আনাতোলিয়ায় গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নামক বিকল্প সরকার সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১৫] সামরিক-বেসামরিক সকলে মিলে একত্রে যুদ্ধ করে বিশাল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর তুরস্ক প্রজাতন্ত্র নামক নতুন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

খ. তুরস্ক প্রজাতন্ত্রে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

প্রখ্যাত অটোমান সেনাকর্মকর্তা মোস্তফা কামাল পাশা (পরবর্তীতে আতাতুর্ক) এর নেতৃত্বে দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হয় এক নতুন রাষ্ট্র। নবগঠিত এই নবীন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে ছিলেন একদল মেধাবী সেনাকর্মকর্তা। ফলে ১৯২৩ সাল থেকে অদ্যাবধি তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ছিল বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নিচে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করা হলো-

আতাতুর্কের শাসনামল, ১৯২৩-৩৮

বিপ্লবী সেনাকর্মকর্তা কামাল পাশার নির্দেশে ১৯২২ সালে ১লা নভেম্বর সালতানাত বিলুপ্ত করে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিপ্লবী সামরিকবাহিনী হয়ে ওঠে নতুন সরকার ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রণ শক্তি।[১৬] মোস্তফা কামাল সামরিকবাহিনী থেকে আগত হলেও তিনি অচিরেই সামরিক উর্দি পরিত্যাগ করে নবীন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদ গ্রহণ করেন। তিনি সামরিকবাহিনীকে একটি পেশাদার বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সামরিকবাহিনী জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ায় রাষ্ট্রের ওপর তাদের এক ধরনের আধিপত্য তৈরি হয় যা তাদেরকে রাষ্ট্রের অভিভাবকে পরিণত করেছিল। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রজাতান্ত্রিক তুরস্কের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো সামরিকবাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনীর দ্বারা। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ব্যক্তিগত জীবনে অটোমান সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুর্কি সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব প্রদান করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলেন। ফলে তুরস্কের জনগণ তাঁকে তুর্কি জাতির জনক হিসেবে মনে করে। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের জীবদ্দশায় তুরস্ক পরিচালিত হয়েছে তার একক নির্দেশে। ফলে সেনাবাহিনী

হয়ে ওঠে তুরস্কের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের অন্যতম প্রধান শক্তি। তাই তাদের অন্য কোনো ভূমিকায় দেখা যায়নি বরং তারা তুরস্কে একটি ইতিবাচক সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কামাল পাশা সামরিকবাহিনীর জেনারেলদের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর এমনকি সংসদের সদস্য পদে মনোনীত করেছিলেন। এমনকি রউফ ওরাবে নামক একজন নৌ কর্মকর্তাকে প্রথমে সংসদে বিরোধী দলের নেতা বানিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তাকে সরকারের প্রধানমন্ত্রী (১৯২২-২৩) করেছিলেন। কোনো কোনো সেনাকর্মকর্তা আতাতুর্কের বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি তাদের এমন কৌশলে করায়ত্ত করেছিলেন যে তারা ভবিষ্যতে আর কোনো দিন তাঁর বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখাননি। তাছাড়া যেসকল সেনা কর্মকর্তা রাজনীতিতে আগ্রহী তিনি তাদের উর্দি ছেড়ে রাজনীতিতে আসার নির্দেশনা প্রদান করেন।[১৭] তাই কামালযুগে তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক মোস্তাফা কামালের প্রভাবের কারণে ইতিবাচকভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। তাছাড়া কামাল পাশা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সম্মোহনী শক্তি দ্বারা সামরিকবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের একই কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরপিপি-এর শাসনামলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক, ১৯৩৮-১৯৫০

আরপিপি-এর শাসনামল বলতে মূলত কামাল আতাতুর্ক প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান পিপলস পার্টির শাসনামলকে বোঝায়। ১৯২৩ সালে রিপাবলিকান পিপলস পার্টি সেক্যুলার আদর্শকে ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে এবং মোস্তফা কামালের নির্দেশে নতুন দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করে। ১৯৩৮ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর পার্টির নেতৃত্ব অর্পিত হয় আরেক সামরিক ব্যক্তিত্ব ও মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের একান্ত সহযোগী ইসমত ইনুনুর হাতে। কেবল পার্টি নয়, মূলত তিনি মোস্তফা কামালের স্থলাভিষিক্ত হন। একই বছর তিনি মিল্লি শেফ বা জাতীয় প্রধান হিসেবে 'ইনুনু' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইনুনুর নেতৃত্বে তুরস্কে একদলীয় শাসনব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। এ সময় তিনি ঘোষণা করেন যে, তুরস্কের সেনাবাহিনী হলো ধর্মনিরপেক্ষতা তথা কামালবাদের রক্ষক। অর্থাৎ তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ বৈপ্লবিক চরিত্র রক্ষা করা তুর্কি সামরিকবাহিনীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এভাবে তুরস্কের সামরিকবাহিনী নানাভাবে তুরস্কের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সামরিকবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকলেও রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ আকার ধারণ করে যে, তা সামরিকবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সামরিক কর্মকর্তাদের জীবনযাত্রা ছিল সংগ্রামপূর্ণ ও অসম্মানজনক। ফলে, তারা সমাজের সর্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতেন।[১৮] রাজনৈতিক ইস্যুতে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক খারাপ না হলেও অর্থনৈতিক কারণে সামরিকবাহিনীর কর্পোরেট ইন্টারেস্ট হুমকির সম্মুখীন হলে তারা ক্রমান্বয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে এবং সামরিকবাহিনীর একটি অংশ সরকার পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালে ইসমত ইনুনু তুরস্কে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করলে ডেমোক্রেটিক পার্টি বা ডিপি নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। এতে সামরিকবাহিনীর বিপ্লবী অংশ যেমন নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায় আশান্বিত হয়ে ওঠে

তেমনি নতুন দলও কামালবাদী সামরিকবাহিনীর বিপরীতে সামরিকবাহিনীর একটি অংশের সমর্থন লাভ করে। এ ধরনের দ্বন্দ্বের ফলে সামরিকবাহিনীর মধ্যে রাজনীতিকরণের নতুন মেরুকরণ শুরু হয়। সামরিকবাহিনীর এই অংশটি রাজনৈতিক দলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। ফলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক কিছুটা শীতল আকার ধারণ করে। এ সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা রাজনৈতিক সংঘাত সৃষ্টি হয়।

ডেমোক্রেটিক পার্টির এক দশকে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক, ১৯৫০-১৯৬০

ইসমেত ইনুনু বহুদলীয় গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থেকে ১৯৪৬ সালের ৭ জানুয়ারি ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নির্বাচনে তারা কিছুটা খারাপ করলেও ১৯৫০ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করলে সামরিকবাহিনীর বিপ্লবী অংশটি প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ আদায়ে আশান্বিত হয়ে ওঠে। এই দলের নেতৃস্থানীয় সেনাকর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেনারেল রাজীব গমুসপালা এরকানলি ও কর্ণেল আলপ আরসালান তুর্কেস । সামরিকবাহিনীর বিপ্লবী সদস্যরা আশায় বুক-বাঁধলেও ডেমোক্রেট সরকার তাদের সেই আশা পূরণ করতে পারেনি। রিপাবলিকান পার্টির সাথে ঐতিহাসিকভাবে সামরিকবাহিনীর সুসম্পর্ক থাকায় ডেমোক্রেটিক পার্টির সাথে সংগত কারণেই ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। যেহেতু সামরিকবাহিনী তুরস্কের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই ডেমোক্রেটিক পার্টি শুরু থেকেই কিছু সেনাকর্মকর্তার সমর্থন লাভের মাধ্যমে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টায় ডিপি কিছুটা হলেও সাফল্য লাভ করে। এ সময়ের অত্যন্ত মেধাবী সেনাকর্মকর্তা সেইফি কুর্তবেগ ডিপি চেয়ারম্যান জালাল বায়ারের অনুরোধে সামরিকবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এবং রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৫০ সালের নির্বাচনে কুর্তবেগ ডিপির মনোনয়ন নিয়ে আঙ্কারা থেকে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন এবং মেন্দেরেস সরকারে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।[১৯] যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। কারণ সামরিকবাহিনীর প্রভাবশালী একটা অংশ প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দেরেসের কানভারি করেছিলেন। এ সময় চিফ অফ জেনারেল স্টাফ নুরী ইয়ামুত ও কোরীয় যুদ্ধের (১৯৫০) নায়ক তাহসিন আজিজি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দেন। এভাবে তারা কিছু সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের সমর্থন পেলেও সামগ্রিকভাবে কামালবাদী সামরিকবাহিনী কোনোভাবেই তাদের কার্যক্রম মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া সামরিকবাহিনীর হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে ডিপি সরকার ব্যর্থ হয়েছিল ফলে রাষ্ট্রে চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নয় জন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয় যা ডেমোক্রেটিক সরকারের সাথে সামরিকবাহিনীর সম্পর্ককে আরও তিক্ত করে তোলে।[২০] সামরিক অফিসারদের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মেন্দেরেস সরকারের ব্যর্থতার অভিযোগে এবং রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে ১৯৬০ সালের ২৭ মে সামরিক অভ্যুত্থানে সংঘটিত হয়।[২১] এতে আদনান মেন্দেরেসের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাশীন ডেমোক্রেটিক পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত

করে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য সামরিক আইনে শাস্তির আওতায় আনা হয়। একই সঙ্গে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে, তাতে সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সম্বন্বয়ে National Security Council (NSC) গঠনের বিধান রাখা হয়। NSC-কে Council of Minister এর উপদেষ্টা পরিষদ বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে তুরস্কে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করে। ১৯৬০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর সামরিকবাহিনী সাংবিধানিকভাবে রাজনীতি ও বেসামরিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতালাভ করে। এ সময়ের পর থেকে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামরিকবাহিনীর হস্তক্ষেপকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। একই সাথে জাতীয় মহাসংসদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়। ১৯৬০ সালের পর থেকে বেসামরিক সরকারের ওপর সামরিকবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুরস্কের রাজনীতিতে একচেটিয়া সামরিক প্রভাব, ১৯৬০-২০০২

১৯২৩ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনী সাংবিধানিকভাবে বেসামরিক সরকারের অধীন এমন একটি পেশাদার বাহিনী ছিল যারা কেবলই বেসামরিক সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় পেশাদারিত্বের সাথে সর্বশক্তি নিয়োগ করত। কিন্তু ১৯৬০ সালের সামরিক অভ্যুত্থান এবং নতুন সংবিধানে সামরিকবাহিনীর ক্ষমতায়নকে কেন্দ্র করে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ভিন্নমাত্রা লাভ করে। এর পর থেকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে প্রতি দশবছর অন্তর সামরিকবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের (ক্যু) মাধ্যমে বেসামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের অনুগত একটি করে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এসকল সরকারের তেমন কোন জনসর্মথন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। এভাবে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর একাধিপত্য এরদোয়ানের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে । ২০০২ সালের জাতীয় নির্বাচনে এরদোয়ানের রাজনৈতিক দল একেপি জয়লাভ করলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক শীতল হতে শুরু করে। সেই প্রেক্ষাপটে ২০১৬ সালে জুলাই মাসে পুনরায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটে।[২২] যদিও এই অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং সামরিকবাহিনীর ওপর বেসামরিক সরকারের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬১-৬৫ সাল পর্যন্ত সামরিকবাহিনী একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনে বাধ্য করে। মূলত সামরিকবাহিনী এ সময় প্রধান নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সামরিকবাহিনীর অনুগত রিপাবলিকান পিপলস পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় তাদেরকে জাস্টিস পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হয়। কিন্তু এই কোয়ালিশন সরকার টেকসই হয়নি। এরকম একটি রাজনৈতিক অস্থিরতা মধ্যে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু সংখ্যক মধ্যম সারির তরুণ সেনা কর্মকর্তা পুনরায় ক্যু বা অভ্যুত্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যদিও শেষ পর্যন্ত এই ক্যুর উদ্যোগ সফল হয়নি। ১৯৬৩ সালের ২১ মে কর্নেল তালাত আয়দামীর নেতৃত্বে আরো একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।[২৩] যেহেতু সামরিকবাহিনীর হাই–কমান্ড প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত

বেসামরিক সরকারের অনুগত সেকারণে সহজেই উভয় সেনা বিদ্রোহ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। এটাও ইতিবাচক সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ফল।

১৯৬৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাস্টিস পার্টি এককভাবে সরকার গঠন করে এবং ১৯৬৫-৭১ সাল পর্যন্ত সামরিকবাহিনী জাস্টিস পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কেননা জাস্টিস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা জেনারেল রাজিব গুমুসপালা এরকানলি (১৮৯৭-১৯৬৪) যিনি সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে স্বল্পকালীন তুরস্কের চিফ অফ জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও সামরিকবাহিনীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং রাজনীতিকরণ বৃদ্ধি পায়। অনেকেই ধারণা করেছিল যে কিছুটা ইসলামপন্থি জাস্টিস পার্টি ক্ষমতাসীন হয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতি সামরিকবাহিনীর নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ নেবে কিন্তু ক্ষমতাসীন জাস্টিস পার্টির নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত দূরদর্শিতার মাধ্যমে সামরিকবাহিনীর সাথে একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পার্টির প্রধান হিসেবে একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা থাকায় সেটা সম্ভব হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই সময়টাই সম্ভবত তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক উষ্ণ সম্পর্কের শ্রেষ্ঠ সময়।

এতৎসত্ত্বেও সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা বেসামরিক সরকারকে অপছন্দ করতেন তারা ১৯৭১ সালে পুনরায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান যা তুরস্কের ইতিহাসে "মেমোরেন্ডাম ক্যু" নামে পরিচিত।[২৪] তবে কেবল পছন্দ অপছন্দই সামরিক অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ নয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এ অভ্যুত্থান সংঘটনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই অভ্যুত্থানে সুলেমান ডেমিরেলের পতন ঘটে এবং সেনা সমর্থিত দুর্বল সরকার দায়িত্ব পালন করে। একটি বেসামরিক সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তাদের সাথে নানা বিষয়ে সামরিকবাহিনীর দূরত্ব তৈরি হয়। এ সময় সামরিকবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ সামরিকবাহিনী এবং রাষ্ট্রের সকল ঐক্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৭১-৭৩ সাল পর্যন্ত সামরিকবাহিনী (Turkish Armed Forces) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৪ সালে বুলেন্ট ইজোভিত (Bulent Ecevit) কে প্রধানমন্ত্রী করে ন্যাশনাল স্যালভেশন পার্টির সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে বেসামরিক সরকারের নিকট পুনরায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[২৫]

যেহেতু সেনা শাসনের প্রেক্ষিতে তুরস্কে তুরস্কে কোন সুন্দর রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ফলে ১৯৭০ এর দশকের শেষ দিকে তুরস্কের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘাত ও হানাহানি দেখা দেয়। এ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ক্ষমতসীন সরকারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ১৯৮০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর জেনারেল কেনান এভরান (Knan Evran) এর নেতৃত্বে তৃতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে সংঘটিত হয়।[২৬] ১৯৮০-৮৩ সাল পর্যন্ত সামরিকবাহিনীই তুরস্কের একক এবং বৈধ শাসক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। ১৯৮২ সালে সামরিক সরকার তুরস্কের জন্য নতুন

সংবিধান প্রণয়ন করে। এই সংবিধানটি ছিল সামরিক সরকারের রক্ষাকবচ। এতে বলা হয় ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল তার কাজের জন্য জাতীয় মহাসংসদে নিকট দায়বদ্ধ নয়। ১৯৮৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাবেক নৌকমান্ডার সায়েম বুলেন্ড উলুসু (Saim Bülend Ulusu) এর নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সামরিক সরকারের যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তাতে ৫ জন মন্ত্রী ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা আর বাকি সদস্যরা ছিলেন দল নিরপেক্ষ। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত শতাধিক সচিব পযমর্যাদার বেসামরিক কর্মকর্তাদের সামরিক সরকারের মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। জেনারেল কেনান এভরানের সামরিক সরকার সাময়িকভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করলে পুনরায় সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালে ৬ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে তারগুত ওজায়েল এর মাদার ল্যান্ড পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ফলে সামরিক সরকার তারগুত ওজায়েলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বেসামরিক সরকার ফিরিয়ে আনেন।[২৭]

১৯৯৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ওয়েল ফেয়ার পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে সামরিকবাহিনী সেটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে ১৯৯৭ সালে সামরিকবাহিনী প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান কে একটি পত্র প্রেরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করতে বললে তিনি পদত্যাগ করেন এবং সাংবিধানিক আদালত এরবাকানের ওয়েলফেয়ার পার্টিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে । সমরবিশারদগণ সামরিকবাহিনী কর্তৃক এ ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে Postmodern Coup বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৮] বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দলকে সামরিকবাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি। ফলে ১৯৬০ সাল থেকে চার দশকেরও অধিক সময় তুরস্কেও সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ছিল অম্ল-মধুর। তবে রেসেপ তায়েপ এরদোয়ান সামরিকবাহিনীর একতরফা ক্ষমতায় ভারসাম্য আনার পূর্ব পর্যন্ত সামরিকবাহিনীই ছিল তুরস্কের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক। বর্তমানে সংস্থাটি বেসামরিক সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ২০১৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হওয়ার পর সামরিকবাহিনীর ওপর বেসামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়েছে।

এরদোয়ানের শাসনামলে আমলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক, ২০০২-২০২৩

২০০২ সালের ৩ নভেম্বর তুরস্কের ১৫তম সাধারণ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক ও রক্ষণশীল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনের ফলাফল সামরিকবাহিনী ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি এবং নানা ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা সরকার গঠন থেকে রেসেপ তায়েপ এরদোয়ানের AKP পার্টিকে বিরত রাখতেও পারেনি। তাই. সামরিকবাহিনী পূর্বের ন্যায় বেসামরিক সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সামরিকবাহিনীর অসহযোগিতা ও নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ক্ষমতাসীন একেপি সরকার ২০১০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি চল্লিশ জনের অধিক সামরিক কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে। ২০০৩ সালে কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের প্ররোচনায় তুর্কি সামরিকবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত এরদোগান

সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ফাঁস হলে ২০১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইস্তাম্বুলের একটি আদালত তিন শতাধিক সামরিক অফিসারদের কারাদণ্ড প্রদান করে। এদের মধ্যে সাবেক তিন বাহিনীর প্রধানগণ ছিলেন।[২৯] এই প্রথম একটি বেসামরিক সরকার কর্তৃক সাবেক ও বর্তমান সামরিক কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতায় আনা হলো। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনী ছিল *De Facto* শাসক এবং ২০০২ সালের পূর্ব পর্যন্ত তুর্কি সমাজ ও রাজনীতিতে এই ধারণাই বিরাজমান ছিল। কিন্তু ২০০২ সালে Justice and Devevopment Party (AKP) ক্ষমতসীন হলে তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি) এই বদ্ধমূল ধারণা ভেঙে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, বেসামরিক সরকারের হাতেই সকল ক্ষমতা এবং তারাই এর নিয়ন্ত্রক। ১৯২৩ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের মধ্যে সামরিকবাহিনীর প্রাধান্য লক্ষণীয়, আবার ২০০২ সালের পর থেকে অদ্যাবধি তুরস্কে বেসামরিক সরকারের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুরস্কের রাজনীতিতে সফল সামরিক অভ্যুত্থানসমূহ (১৯৬০, ১৯৭১, ১৯৮০, ১৯৯৭) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুরস্কে সামরিক-বেসামরিক সম্পকের মধ্যে সামরিকবাহিনীর কতটা প্রভাব রয়েছে তা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আর ২০০২ সালের পর থেকে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেসামরিক সরকারের কতটা প্রভাব রয়েছে তাও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

২০০২ সালে তুরস্কের রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে একতরফাভাবে সামরিকবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার তুরস্কের সামরিকবাহিনী আবেগ তাড়িত হয়ে নিজেদেরকে প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষক মনে করে বিজয়ী ইসলামপন্থি একেপিকে প্রজাতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ফলে তুরস্কের সামরিক-বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তিনশতাধিক সামরিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে এবং সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই সামরিক অভ্যুত্থানে মধ্যে দিয়ে। যদিও শেষ পর্যন্ত এই ক্যু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্যু ঘোষণার সামরিকবাহিনী ট্যাংক, মিলিটারি এপিসি ও অন্যান্য সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লে বিদেশি গোয়েন্দা ও নিজস্ব সোর্স মারফত খবর পেয়ে এরদোয়ান স্থান ত্যাগ করেন এবং ভিডিয়ো বার্তায় নিজের নিরাপদ অবস্থানের কথা জানিয়ে সকলকে ক্যু প্রতিহত করার আহ্বান জানান। এরদোয়ানের ভিডিয়ো বার্তায় একদিকে যেমন সামরিকবাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় অন্যদিকে দলীয় নেতাকর্মী ও জনসাধারণের মনোবল চাঙা হয় এবং তারা দ্রুতগতিতে রাজপথে নেমে আসে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দেখা যায় সাধারণ জনগণ বসফোরাস ব্রিজের ওপর অবস্থানরত ট্যাংকে ওপর উঠে উল্লাস করছে এবং সেনা সদস্যদের প্রহার করছে। এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এরদোয়ান পুনরায় সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং বিপুল সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচিত সরকার উৎখাতের অভিযোগে গ্রেফতার করেন। এ ঘটনার পর থেকে সামরিকবাহিনীর ওপর বেসামরিক সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর এরদোয়ান সেনাপ্রধান ও চিফ অফ জেনারেল স্টাফ জেনারেল হুলসি আকরকে

বিপ্লবীদের হাত থেকে মুক্ত করে তাঁকে স্বপদে বহাল করেন এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাকেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। হুলসি আকরের পর যিনি তুরস্কের সেনাপ্রধান ও চিফ অফ জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে এরদোয়ান পুনরায় জয়লাভ করার পর তাকেও তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়।[৩০] চিফ অফ জেনারেল স্টাফকে সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগের মাধ্যমে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কোন্নয়নের যে ধারা রেসেপ তায়েপ এরদোয়ান চালু করলেন তা তুরস্কের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। যদি ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক তিক্ত হওয়ার সুযোগ থাকবে না।

৯. উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, তুরস্কের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক একটি বহুল আলোচিত ও বৈচিত্র্যময় বিষয়। কেবল তুরস্ক নয় যে–কোনো রাষ্ট্রের উন্নয়ন অগ্রগতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য শান্তিপূর্ণ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি। তুরস্কের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে বা জাতিসত্তার কারণে ঐতিহাসিকভাবে তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। অটোমান শাসনামল বা তারও পূর্বে যুদ্ধই ছিল তুর্কি জাতির নেশা ও পেশা। পরবর্তী অটোমান আমলে জ্যানিসারি বাহিনীসহ সামরিকবাহিনী হয়ে ওঠে অটোমানদের বিজয়ের প্রধান অনুষঙ্গ। ফলে অটোমান স্বর্ণযুগে সামরিকবাহিনীর সাথে বেসামরিক প্রশাসন বিশেষ করে সুলতান ও তার অমাত্যবর্গের সাথে সামরিকবাহিনীর সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে এটাও সত্য সামরিকবাহিনী বিশেষকরে জ্যানিসারি বাহিনীর স্বেচ্ছাচারিতা সীমা অতিক্রম করলে সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং সুলতানকে বাধ্য হয়ে জ্যানিসারি বাহিনী বিলুপ্ত করতে হয়। এ সকল ঘটনার ফলশ্রুতিতে একসময় তিন মহাদেশের মহাপরাক্রমশালী অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তদস্থলে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র নামে নতুন রাস্ট্র আত্মপ্রকাশ করে। প্রজাতান্ত্রিক শাসনামলে সামরিকবাহিনী কামালীয় বাহিনী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ সময় সামরিকবাহিনীকে বলা হতো ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের রক্ষাকবচ বা ভ্যানগার্ড। আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্কের চিড় ধরতে থাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৬০ সালের রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এরপর থেকে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব সাংবিধানিকভাবেই বৈধতা লাভ করে। সামরিকবাহিনী হয়ে ওঠে তুরস্কের রাজনীতির প্রধান শক্তি। তাদের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ভূরাজনীতিরও প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে সামরিকবাহিনী। তুরস্কের রাজনীতিতে সামরিকবাহিনীর এই প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে এরদোয়ানের ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত। ২০০২ সালে রেসেপ তায়েপ এরদোয়ান বিজয়ী হয়ে সামরিকবাহিনীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। বেসামরিক সরকারে এই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা সামরিকবাহিনী মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। ফলে ২০১৬ সালে সামরিকবাহিনী পরাশক্তি সহযোগিতায় এরদোয়ান সরকারের পতন ঘটাতে সামরিক অভ্যুত্থান বা ক্যু ঘোষণা করেন। যদিও দেশি ও বিদেশি গোয়েন্দা

মারফত এ খবর পেয়ে এরদোয়ান ক্যু প্রতিহত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন এবং তিনি সফল হন। ২০১৬ সালে পর থেকে তুরস্কের বেসামরিক সরকার সামরিকবাহিনীর ওপর পূর্ণনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ২০২৩ সালে প্রজাতন্ত্রে শতবর্ষে এরদোয়ান কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে পুনরায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে সাবেক সেনা প্রধানকে সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগ করেন, এতে একদিকে সামরিকবাহিনীর ওপর যেমন সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় আবার তেমনি সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক পূর্বের যে-কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. 'পাশা' ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা,গর্ভনর, প্রাদেশিক শাসক ও মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের সম্মানসূচক উপাধি। সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত 'পাশা' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা উচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এটা অনেকটা ব্রিটিশ সরকারের 'নবাব' উপাধির মতো।

২. যাযাবর তুর্কিরা মধ্য এশিয়া থেকে মোঙ্গলদের তাড়া খেয়ে এশিয়া মাইনরে আসার পথে কোনিয়ার মুসলিম শাসনকর্তা আলাউদ্দীন কায়কোবাদকে যুদ্ধে সহায়তার পুরস্কার হিসেবে তারা এশিয়া মাইনরের সুগুত নামক জায়গাটি লাভ করে। পরবর্তীতে এটাকে কেন্দ্র করে বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বে মিত্রশক্তি অটোমান সাম্রাজ্য বণ্টনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন গোপন চুক্তি সম্পাদন করে। সাইকস-পিকো চুক্তি এর অন্যতম। ১৯১৬ সালে ব্রিটেনের কূটনীতিক মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের কূটনীতিক জর্জ পিকোর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৪. Feroz Ahmed, *The Making of Modern Turkey*, (London and New York: Rutledge,1994) , 1-2.

৫. সান জু, *দি আর্ট অব ওয়ার* (আ ম ম ফজলুর রাশিদ অনূদিত), (ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৭), xii-xiii.

৬. Charles H. Kennedy and David J. Louscher (Edited*), Civil Military Interaction in Asia and Africa,* (New York: E.J. Brill, 1991), 1.

৭. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil Military Relations* , (Cambridge:Mass: Belknap Press,1957), 28.

৮. *Ibid.*

৯. Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing societies,(* New Haven: Yale University Press,1975) ,11.

১০. Erick J. Zürcher, *Turkey, A Modern History,* (London: IB Tauris & Co. LTd. , 1995), 289.

১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Hakan_Fidan (accessed on, 10/09/25).

১২. সাহদাত হোসেন, *অটোমান সাম্রাজ্যের স্মরণীয় অধ্যায়* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৮),৬৭

১৩. Bernard Lewis, *The Emergence of Modern Turkey*, (London: Oxford University, 1968), 79.

১৪. Dr. Gerassimos Karabelias, *CIVIL-MILITARY RELATIONS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ROLE OF THE MILITARY IN THE POLITICAL TRANSFORMATION OF POST-WAR TURKEY AND GREECE:*

1980-1995, Final Report submitted to North Atlantic Treaty Organization (NATO) in June 1998, 20, https://www.nato.int/acad/fellow/96-98/karabeli.pdf,(accessed on, 20.11.2020.).

১৫. এই সরকার অনেকটা বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বা 'মুজিবনগর সরকারের' মতো যা ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই সরকারের নেতৃত্বে যেমন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তেমনি 'আনাতোলিয়ার বিপ্লবী সরকারের' মাধ্যমে তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। [সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য ১ম খণ্ড*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮)]

১৬. Erick J. Zürcher, *Ibid,* 168.

১৭. Feroz Ahmed, *Ibid,* 57.

১৮. *Ibid*, 123.

১৯. William Hale, *Turkish Politics and the Military*, (UK: Routledge, 1994), 92.

২০. *Ibid, 100.*

২১. Mehmet Ali Birand, *The Generals' Coup in Turkey an inside story of 12 September 1980,* (Translated by M.A Dikerdem), (UK: Brassey's, ,1987), ix-xi.

২২. https://www.insightturkey.com/book-reviews/turkeys-july-15th-coup-what-happened-and-why.

২৩. সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য ১ম খণ্ড*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৮), ২০৩।

২৪. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ, *আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান (বদলে যাওয়া তুরস্কর ১০০ বছর)*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৯), ৭৫-৭৬।

২৫. হাফিজুর রহমান, *এরদোয়ান দ্যা চেঞ্জমেকার*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ২০১৮), ২৯।

২৬. Mehmet Ali Birand, *Ibid,* ix-xi.

২৭. হাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, ৫১।

২৮. *https://en.wikipedia.org/wiki/1997_Turkish_military_memorandum*

২৯. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২।

৩০. তুরস্কের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল ইয়াসর গুলার দেশটির চিফ অফ জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। ২০২৩ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর এরদোয়ান সরকার গঠন করলে সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। একইভাবে জেনারেল ইয়াসর গুলার এর পূর্বে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন সাবেক চিফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল হুলসি আকর। ২০১৬ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর এরদোয়ান সরকার সামরিকবাহিনীকে শত্রু মনে না করে বরং সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিয়োগের এই ধারা সেটাই প্রমাণ করে। [বিস্তারিত জানতে তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখা যেতে পারে]